দৈনিক ইনকিলাব

28 JUN 1987

[redacted] 28 JUN 1987

[redacted] ... 6 ... 1 ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

দেওবন্দ শিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রতীক

গোলাপ মুনীর

ভারতীয় মুসলমানদের জন্য উনবিংশ শতাব্দীটি বিশেষভাবে অমঙ্গলজনকই ছিল। এককালের প্রতিভাদীপ্ত মোগলদের মধ্যে যে অবনতি দেখা দিয়েছিলো ইংরেজগণ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। ফলে কার্যতঃ এই উপমহাদেশের মুসলিম জন গোষ্ঠী একটি শক্তিহীন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ দৃশ্যতঃ বিফল হলেও, ইংরেজদেরেকে অন্তত পক্ষে এইটুকু ভালভাবেই বুঝিয়ে দিল যে, এদেশে বেনিয়া ইংরেজদের কোন স্থান নেই। যাই হোক, এই সময়ে খুব সীমিত পর্যায়ে হলেও ভারতীয় মুসলমানগণ এই উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৮৫৭) এক দশক পরেই রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে ছোট শহর দেওবন্দে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে অবশ্য এটি একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। মোহাম্মদ কাশিম ও রশিদ আহমদ নামে দু'ব্যক্তি এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন সুবিন্যস্ত কাঠামো ও একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসাই ছিল এই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বস্তুত তখনকার দিনে এটিই ছিল মুসলিম শিক্ষা ও চেতনার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অবশ্য দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভের আরো কিছু পরে ১৮৬৭ সালে লক্ষ্ণৌতে নাদওয়াতুল উলামা নামে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং নাদওয়াতুল উলামা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের দু'টি নেতৃস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—ঠিক যেমনিভাবে ইরানের কুম এবং মিসরের আল-আজহারের প্রসিদ্ধি ঘটেছিল। এখানে বলা দরকার, এই দু'টি প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাই প্রদান করা হতো না, সাথে সাথে মুসলমানদের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও সচেতন করে তোলা হত। কেননা, এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আলেমদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার উপযোগী করে গড়ে তোলা, যাতে করে তারা দখলদার ইংরেজ কর্তৃত্ব মোকাবেলায় সক্ষম হতে পারে।

দেওবন্দ অবশ্য এর বহু আগে থেকেই মুসলমানদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছিল। তখন এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন মোগল শাসকগণ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে এখানকার অনেকেই ইংরেজদের ফাঁসীতে ঝুলেছিলেন। কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন ইংরেজদের দেয়া মাটি চাপাতে। দেওবন্দ মাদ্রাসা পরিচালনার জন্যে ৮টি মূলনীতি ছিল। এই নীতিগুলো মোহাম্মদ কাশিম প্রণয়ন করেছিলেন। এই নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে—পারস্পরিক শলাপরামর্শের উৎসাহিতকরণ, শাসকদের সাথে সহযোগিতা, অনমনীয় ধ্যান-ধারণা পরিহার এবং সাধারণ কর্মসূচীতে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত মতামত জোড়ালো না করা।

প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ছিল সুনির্দিষ্ট। এর প্রশাসনিক কাঠামো ছিল দিল্লীর সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিল্লী কলেজেরই অনুরূপ। শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে রেক্টর (সরপরাস্ত), চ্যান্সেলর (মুহতামিম) এবং প্রিন্সিপ্যাল (সদর মুদাররিস)। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বিচার বিভাগ দেখা শোনার জন্যে মুফতী নিয়োগ করা হয়। এরা শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে থাকেন। এই শিক্ষা কর্মসূচীর প্রাথমিক মেয়াদ দশ বছর হলেও পরবর্তীতে তা কমিয়ে ছয় বছরে আনা হয়। তখনকার দিনে এই শিক্ষা পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সুশৃংখল ও উদ্ভাবনামূলক। এর কেন্দ্রীয় পাঠাগারটি ছিল অনন্য। পূর্বে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশীর ভাগই রাষ্ট্রীয় অনুদানে চলতো। দেওবন্দ একটি নয়া অর্থনৈতিক ধারা সৃষ্টি করলো। চালু হলো গণতহবিল সৃষ্টির জটিল প্রক্রিয়া। সমাজের বিভিন্ন স্তরের দান গ্রহণ করা হতো। তবে প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে বৃটিশ অনুদান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এর স্বাধীনতা রক্ষায় বিষয়টি এর মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলনীতিতে বলা হয়েছেঃ যতদিন না মাদ্রাসার কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হবে, ততদিন আল্লাহ যেমনটি চালাবেন, ঠিক তেমনভাবেই মাদ্রাসা চলবে।

অন্যদিকে নাদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠাতাগণ ধনী ও সরকারী শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব (যারা উচ্চ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন), ব্যবসায়ী, আইনজ্ঞ, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতা সাদরে গ্রহণ করতেন।

দেওবন্দ ও নাদওয়াতুল উলামা শিক্ষার্থীদের এমনিভাবে তৈরী করতে পেরেছিল যার ফলে এইসব উলামা সামাজিক মর্যাদার একটি স্তরে পৌছুতে পেরেছিলেন। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দু'টি আরেকটি বিষয়ের উপর জোর তাগিদ প্রদান করেছিল। বিষয়টি হলোঃ মুসলমানগণ যথাযথ উপায়ে ইসলামী আইনের অনুসারী হোক।

দেওবন্দ ও নাদওয়াতে পাঠ প্রদানের ভাষা ছিল উর্দু। কারণ এই উপমহাদেশে মুসলমানদের সাধারণ যোগাযোগের ভাষা হিসেবে তারা উর্দুকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কাবুল থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত এলাকার লোকেরা এখানে পড়তে আসতেন। কিন্তু সমগ্র এলাকার লোকদের কোন সাধারণ ভাষা ছিল না। সেহেতু উর্দু ভাষাতেই তাদের পাঠাভ্যাস করতে হতো। তবে এই প্রতিষ্ঠানের আরবী ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষার মান ছিল অত্যন্ত উচুঁ। ১৮৮০ সালে হোসেইন আহমদ নামক জনৈক ছাত্র মত প্রকাশ করে বলেন—'অন্যান্য সরকারী স্কুলগুলোর তুলনায় দেওবন্দের পরীক্ষা অনেক কঠিন। ফলে এখানকার অনেক ছাত্রই অন্যত্র চলে যায় কিংবা ইংরেজী স্কুলে গিয়ে ইংরেজী পড়ে।'

দেওবন্দে যে সব বিষয় বিশেষভাবে পড়ানো হতো সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ মানকুলাত—কোরান শিক্ষা, হাদীস ও মা'কুলাত—আইন, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের যুক্তি সংক্রান্ত পাঠ। অবশ্য দেওবন্দে যুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ের উর্ধ্বে হাদীস ও ফেকাহকে স্থান দেয়া হতো। পরবর্তী সময়ে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান বিষয় এখানে পড়ানো হবে কি হবে না এ নিয়ে বিতর্ক উঠে। তবুও চাকুরী পাওয়ার সুবিধার্থে সিলেবাসে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান বিষয়টিও রাখা হয়।

এইভাবে দেওবন্দে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠলো, তা একদিকে যেমনি ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠে গ্রহণযোগ্য। আর অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। দেওবন্দী আলেমদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো, ফতোয়া প্রদান করা। এজন্যে ১৮৯৩ সালে দারুল ইফতা গঠন করা হলো। এই দারুল ইফতা বৃটিশ কোর্টে মামলার রায় পর্যালোচনা করতো।

এখন থেকে ১৯ বছর আগে ১৯৬৭ সালে দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করা হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে টিকে আছে, কিংবা এর উচুমানের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারটিই শুধু এর সফলতা নয়। এছাড়াও এর উল্লেখযোগ্য সফলতা হলো সারা দেশে দেওবন্দ পদ্ধতি অনুসরণে বহুসংখ্যক শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৭ সালে সারা ভারতে দেওবন্দ পদ্ধতির ৮,৯৩৪টি স্কুল চালু ছিল বলে এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সাহারানপুরের মুজাহির-ই-উলামা এবং দিল্লীর মাদ্রাসা-ই-আমিনিয়া সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মুজাহির-ই-উলামার আকার ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে এটিকে অনেকেই দ্বিতীয় দেওবন্দ নামে আখ্যায়িত করেছেন। মুলতঃ দেওবন্দ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমগণই এই দু'টি মাদ্রাসার সার্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। মাদ্রাসা-ই-আমিনিয়ার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন দেওবন্দ থেকে পাস করা একজন গ্রাজুয়েট। তিনি ভাল সরকারীপদ উপেক্ষা করে প্রিন্সিপ্যালের পদে যোগদান করেন।

দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ কাশিম এবং রশিদ আহমদকে তৎকালীন মুসলিম জনগণ মহৎ ব্যক্তি হিসেবে খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। রশিদ আহমদকে তারা 'মুজাদ্দিদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুজাদ্দিদ কথার অর্থ সংস্কারক।

আজও বহু ছাত্র দেওবন্দ ও নাদওয়াতে লেখাপড়া করেন। তাছাড়া সাধারণ মানুষ এই প্রতিষ্ঠান দু'টির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা (যেমনঃ বক্তৃতা ও সম্মেলন সুবিধা) লাভ করে থাকেন। দেওবন্দ ও নাদওয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দেওবন্দ ও নাদওয়া ছিল উনবিংশ শতাব্দির মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলনের এক সফল প্রতীক।